❑ বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ ঃ

বিপুল প্রাণশক্তি থাকা সত্ত্বেও ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মহাবিদ্রোহ চূড়ান্ত সাফল্য পায়নি। ব্যাপ্তি ও গভীরতার দিক থেকে এই মহাবিদ্রোহ ইতিপূর্বে ভারতে সংগঠিত সব আন্দোলনকেই অতিক্রম করেছিল। তবুও মাত্র এক বৎসর কয়েক মাস ছিল তার স্থায়িত্ব। কোনো লক্ষ্যকে স্পর্শ না করেই বিদ্রোহের শেষ অগ্নিকণা নির্বাপিত হয়েছিল। এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী ছিল বিদ্রোহের অন্তর্নিহিত কিছু দুর্বলতা।

উপযুক্ত নেতৃত্ব ও পরিকল্পনার অভাব বিদ্রোহের ব্যর্থতা অনিবার্য করেছিল। যে-কোন বৃহত্তর গণ-আন্দোলন সফল করার প্রাথমিক শর্তই হল সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা। মহাবিদ্রোহের ক্ষেত্রে এই প্রাথমিক শর্তের অভাব ছিল প্রকট। বিদ্রোহীদের কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল না। ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচীও ছিল না। ভারতবাসীর কাছে বাহাদুর শাহের ভাবমূর্তি ছিল খুবই ম্লান। নানাসাহেব, লক্ষ্মীবাঈ, ব্যক্তিগতভাবে দক্ষ হলেও, তাঁদের কোনোরূপ জাতীয় ভাবমূর্তি ছিল না। আঞ্চলিক সংগঠক হিসেবে দক্ষতা দেখালেও, ভারতের জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার মতো প্রতিভা বা ইচ্ছা তাঁদের ছিল না। ফলে আন্দোলন ছিল বিচ্ছিন্ন, তাই দুর্বল। পাঞ্জাবের শাসক ও ইংরেজ সেনাপতি হেনরী লরেন্স স্বীকার করেছেন যে, সিপাহিদের মধ্যে যদি একজনও প্রতিভাবান নেতা থাকত, তাহলে আমাদের সর্বনাশ হত। পরন্তু বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দের লক্ষ্যের ভিন্নতা আন্দোলনের প্রাণশক্তি শিথিল করেছিল। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের লক্ষ্য ছিল দিল্লির সিংহাসন এবং ভারত-সম্রাট পদ লাভ। নানাসাহেব লড়ছিলেন পেশোয়ার স্বাধীন কর্তৃত্ব ও মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। অন্যান্য নেতারাও নিজ নিজ আঞ্চলিক কর্তৃত্ব রক্ষার লক্ষ্যে অস্ত্র ধরেছিলেন। নেতৃবৃন্দের লক্ষ্য কেবল পৃথক ছিল না, পরস্পরবিরোধীও ছিল। যেমন ভারত-সম্রাটের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে পেশোয়ার স্বাধীন অস্তিত্ব থাকা সম্ভব হত না। সম্ভবত এই কারণে নেতৃবৃন্দ যৌথ কর্মসূচী গ্রহণে দ্বিধান্বিত থেকে বিদ্রোহকে দুর্বল করেছিলেন।

দক্ষ সৈনিক ও উন্নতমানের অস্ত্রের অভাব বিদ্রোহীদের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল। ইংরেজ-বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র ছিল আধুনিক। ইংরেজের উন্নত রাইফেল ও কামানের সাথে সিপাহিদের অনুন্নত 'মাস্কেট' বন্দুক ও তরবারি, বর্শা ইত্যাদির দীর্ঘ লড়াই ছিল অসম্ভব এবং পরাজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী। সেনাবাহিনীর সংখ্যাধিক্যও ইংরেজের সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল। বিদ্রোহের সূচনাকালে ইংরেজ সেনাবাহিনীর বহু সদস্য সিঙ্গাপুরে উপস্থিত ছিল। নিকট প্রাচ্য সমস্যায় বিব্রত ব্রিটিশ সরকার ইংল্যান্ড থেকে সত্বর বাহিনী পাঠিয়ে ভারত সরকারকে সাহায্য করতে পারেনি। ফলে প্রথমদিকে বিদ্রোহীদের অগ্রগতি অপ্রতিহত ছিল। কিন্তু ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শেষ হবার ফলে ইউরোপ থেকে নতুন বাহিনী ভারতে বিদ্রোহ দমনে প্রেরিত হয়। সিঙ্গাপুর থেকেও ইংরেজ-বাহিনীকে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়। ফলে বিদ্রোহের মাঝপথে সরকারের সৈন্যশক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং বিদ্রোহীরা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

কৌশলগত ত্রুটিও বিদ্রোহীদের পতন ডেকে আনে। উন্নত অস্ত্রে সজ্জিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সংখ্যাধিক ইংরেজ-বাহিনীর বিরুদ্ধে তুলনায় দুর্বল ও সংখ্যাল্প বিদ্রোহীদের সম্মুখ যুদ্ধে সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল ক্ষীণ। কিন্তু উন্মত্ত বিদ্রোহীরা সেই ভুলটাই করেছিল। দূরদর্শিতার অভাবহেতু বিদ্রোহী সেনাপতিরা প্রয়োজনভিত্তিক রণকৌশল উদ্ভাবন করতে ব্যর্থ হন। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা যদি ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে চোরাগোপ্তা আক্রমণ হানতেন, তাহলে ইংরেজ-বাহিনীকে

অনেক বেশি বিব্রতকর পরিস্থিতির সামনে পড়তে হত। সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন : 'জনযুদ্ধের তত্ত্ব ও কৌশল গ্রহণ না-করে বিদ্রোহীরা ভুল করেছিল।' তাঁর মতে, কৃষক জনসাধারণকে সংগঠিত করে গ্রামাঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতি দ্বারা ইংরেজ বাহিনীকে আঘাত করলে কার্যকরী ফল পাওয়া যেত।

রাজনৈতিক চেতনার অভাব এবং জাতীয় স্বাধীনতার অস্পষ্ট ধারণা বিদ্রোহের ভিত্তি দুর্বল করেছিল। সুপ্রকাশ রায়ের মতে, বৈপ্লবিক সংগ্রাম পরিচালনার মতো আধুনিক বুর্জোয়া গোষ্ঠী ও শ্রমজীবীশ্রেণী তখন ভারতে ছিল না। ফলে বিদ্রোহীরা চালিত হয়েছিল তথাকথিত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান স্তম্ভ রাজা, জমিদার, তালুকদার প্রমুখ শ্রেণি দ্বারা। এই গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে কৃষক শ্রেণিকে সর্বদা বিদ্রোহ থেকে দূরে রাখতে প্রয়াসী ছিলেন। অমলেন্দু দাশগুপ্ত 'Our First National War' প্রবন্ধে এই মত সমর্থন করে লিখেছেন ঃ 'ব্রিটিশের উন্নত ও শক্তিশালী অস্ত্রের প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজন ছিল ব্যাপক গণ-চেতনা ও গণ-অভ্যুত্থানের। কিন্তু সামন্ততান্তিরক নেতৃত্ব গ্রামীণ শ্রমজীবী শ্রেণিকে এই অভ্যুত্থানের সামিল করতে সাহসী হননি।

ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর পাশবিক অত্যাচার এবং কোন কোন মুঘল কর্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতা বিদ্রোহীদের ব্যর্থতার কারণ ছিল। মহাবিদ্রোহকে দমন করার জন্য সভ্য ব্রিটিশ সরকার যে চণ্ডনীতি গ্রহণ করে, তা এক কথায় নজিরবিহীন। প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ মার্কস এবং এঙ্গেল্‌স লিখেছেন ঃ 'পাশবিক নিষ্ঠুরতার যে দৃষ্টান্ত ইংরেজ সেনা মহাবিদ্রোহ দমনে দেখিয়েছে, তা ইউরোপ বা আমেরিকার কোনো বাহিনী কদাপি দেখায়নি।' ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন তাঁর 'Eighteen Fifty Seven' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, মুঘল কর্মচারী এবং বিদ্রোহীদের সাথে আপাতযুক্ত কলি খাঁ, মহম্মদ আলি (নুনে নবাব) প্রমুখ একাধিক সামরিক ব্যক্তি গোপনে ইংরেজের সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং বিদ্রোহীদের গোপন সংবাদ সরবরাহ করা, বিদ্রোহীদের বিচ্ছিন্ন করা ইত্যাদি কাজে লিপ্ত ছিলেন।

দেশের অভিজাত এবং বুদ্ধিজীবীদের বৃহত্তর অংশ মহাবিদ্রোহের বিরোধিতা করে আন্দোলনের প্রাণশক্তিকে দুর্বল করেছিলেন। সিন্ধিয়া, হোলকার, নিজাম, বহু রাজপুত গোষ্ঠী, ভূপালের নবাব প্রমুখ বিদ্রোহ দমনের কাজে সর্বশক্তিসহ ইংরেজের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। লর্ড ক্যানিং স্বীকার করেছেন যে, ভারতীয় শাসকদের সমর্থন না-পেলে ইংরেজকে সত্বর তল্পিতল্পা-সহ ভারত ছাড়তে হত। বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর প্রতিবিপ্লবী মানসিকতা বিদ্রোহীদের মনোবল হ্রাস করেছিল। বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন যে, সমকালীন বুদ্ধিজীবীরা বিদ্রোহীদের সাফল্য ও ইংরেজ শাসনের অবসানের মধ্যে ও প্রাক্-ব্রিটিশ অন্ধকারময় যুগের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা দেখিয়েছিলেন। দুঃখজনক এই সত্য বিপ্লবের মানসিক বন্ধ্যাত্বকে প্রকট করেছিল।

বিদ্রোহ দমনে ইংরেজ সাফল্যের একটি বড় কারণ ছিল সদ্য প্রতিষ্ঠিত টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থার সুবিধা। মি. রাসেল (W. H. Russel) 'My Diary in India' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'ভারতে টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থা না-থাকলে এই বিদ্রোহে (১৮৫৭ খ্রিঃ) প্রধান সেনাপতির যুদ্ধ পরিচালনা ক্ষমতা অর্ধেক হ্রাস পেত। টেলিগ্রাফ তাঁর ডান হাতের থেকেও বেশি কার্যকর ছিল।' টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থা বিভিন্ন অঞ্চলের অভ্যুত্থান সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ এবং দ্রুত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারকে ভীষণভাবে সাহায্য করেছিল।